ছেলেবেলা

ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা
বিশ্বভারতী, ৬৷৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ... ভাদ্র, ১৩৪৭

মূল্য—১৷৹, ২৲

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

ভূমিকা

গোঁসাইজির কাছ থেকে অনুরোধ এল ছেলেদের জন্যে কিছু লিখি। ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক। চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেতলোকে প্রবেশ করতে। এখনকার সঙ্গে তার অন্তর বাহিরের মাপ মেলে না। তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁওয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয়নি, সম্ভব অসম্ভবের সীমাসরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো। সেই সময়টুকুর বিবরণ যে-ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যখন কেটে যেতে লাগল তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করিনি কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি— কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর বয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে। সেইখানে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে কেমন করে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। সমস্ত বিররণটাকেই

ছেলেবেলা আখ্যা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা এই যে ছেলেমানুষের বুদ্ধি তার প্রাণশক্তির বুদ্ধি। জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণযোগ্য। যে পোষণ পদার্থ তার প্রাণের সঙ্গে আপনি মেলে বালক তাই চারিদিক থেকে সহজে আত্মসাৎ ক'রে চ'লে এসেছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা তাকে মানুষ করবার চেষ্টাকে সে মেনে নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণেই।

এই বইটির বিষয় বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে কিন্তু তার স্বাদ আলাদা✓সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হোলো কাহিনী এ হোলো কাকলী,✓সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে। ফলের সঙ্গে চারদিকের ডাল-পালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিছুকাল হোলো একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম "ছড়ার ছবি"। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এ বইটাতে বালভাষিত গদ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেলেবেলা

ছেলেবেলা

১

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্ছড়্ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বেরকরা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তক্‌মা আঁকা, চামড়ার আধঘোম্‌টাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। রোদ বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের

গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি, তার মানে, লজ্জা শরমের মাথা-খাওয়া কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও; বড়োমানুষের ঝি-বউদের পালকির উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হোত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজী। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমরানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পালকি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরি-ওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হোত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কখনো বা কাঁচা শাকসুদ্ধ মুলো খেত আরামে, আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম রাধাকৃষ্ণ; সে যতই

হাঁ হাঁ করে দুহাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস না ছিল বিজলি বাতি, কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই-সলতের একটা সেজ।

মাস্টার মশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তারপর চলত চোখ রগড়ানি। বারবার শুনতে হোত মাস্টার মশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা ব'লে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্খু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়খড়ির আব্রুদেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের

আনাচে কানাচে। কোন্ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকি সুর, দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে-ভূতটা সব চেয়ে ছিল বদমেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন পাতাওয়ালা বাদাম গাছ, তারি ডালে এক পা, আর অন্য পা-টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি, তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত লোকটার ধর্ম্ম জ্ঞান একটুও নেই, দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলে ছিল যে টেবিলের নিচে পা রাখলে পা সুড়সুড় করে উঠত।

তখন জলের কল বসেনি। বেহারা বাঁখে করে কলসি ভরে মাঘ ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নিচের তলার সেই সব স্যাঁৎসেতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করেছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উলটো দিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়ি

ভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হোত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরৎ দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ ছায়াপড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদাম গাছটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্ম-দত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

২

পালকিখানা ঠাকুর-মাদের আমলের। খুব দরাজ বহর তার, নবাবী ছাঁদের। ডাণ্ডা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কানে

মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাতকাটা মেরজাই পরা বেহারার দল সূর্য ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পালকির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে, দাগ ধরেছে যেখানে সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ যেন একালের নামকাটা আসবাব, পড়ে আছে খাতাঞ্চিখানার বারান্দায় এক কোণে। আমার বয়স তখন সাত আট বছর। এ সংসারে কোনো দরকারী কাজে আমার হাত ছিল না ; আর ঐ পুরানো পালকিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই জন্যেই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল। ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্‌সন্‌ক্রুসো, বন্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চারদিকের নজরবন্দী এড়িয়ে বসে আছি।

তখন আমাদের বাড়িভরা ছিল লোক, আপন পর কত তার ঠিকানা নেই ; নানা মহলের চাকর দাসীর নানাদিকে হৈ হৈ ডাক।

সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী ধামা-কাঁখে বাজার করে নিয়ে আসছে তরি-তরকারি, তখন বেহারা বাঁখ কাঁধে গঙ্গার জল আনছে, বাড়ির ভিতরে চলেছে

তাঁতিনী নতুন ফ্যাসান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে, মাইনে করা যে দিনু শ্যাকরা গলির পাশের ঘরে বসে হাপর ফোঁস ফোঁস করে বাড়ির ফরমাশ খাটত সে আসছে খাতাঞ্চিখানায়, কানে পালখের কলম গোঁজা কৈলাস মুখুজ্জের কাছে, পাওনার দাবি জানাতে, উঠোনে বসে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরী। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে। চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন ফেলছে বিশ পঁচিশবার ঘন ঘন। ভিখিরির দল বসে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা করে।

বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে ওঠে; পালকির ভিতরকার দিনটা ঘণ্টার হিসাব মানে না। সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের, যখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে সভাভঙ্গের ডঙ্কা বাজত, রাজা যেতেন স্নানে চন্দনের জলে। ছুটির দিন দুপুরবেলা যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে। একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি, হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলছে পালকি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে সব দেশের বইপড়া নাম আমারি

লাগিয়ে দেওয়া। কখনো বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করছে, গা করছে ছম্ ছম্। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম, ব্যাস্ সব চুপ। তারপরে একসময়ে পালকির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খী, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্‌ছপ্ ছপ্‌ছপ্, ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, সামাল সামাল, ঝড় উঠল। হালের কাছে আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ,—আর কচ্ছপের ডিম।

সে আমার কাছে গল্প করেছিল একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে হঠাৎ এল কাল-বৈশাখী।

ভীষণ তুফান, নৌকো ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁৎরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি। গল্পটা এত শিগগির শেষ হোলো, আমার পছন্দ হোলো না। নৌকোটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্‌পই নয়। বারবার বলতে লাগলুম তারপর? সে বললে, তারপর সে এক কাণ্ড। দেখি এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফজোড়া। ঝড়ের সময় সে উঠেছিল ওপারে

গঞ্জের ঘাটের পাকুড়গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে। খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এত্তো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়াল আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল-টকটকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম আও বাচ্ছা। সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্যে যতই ছটফট করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে। এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম আবদুল সে মরে গেল নাকি। আবদুল বললে, মরবে তার বাপের সাধ্যি কী। নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তারপরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না। আমি বললুম, আচ্ছা বেশ, বাঘ তো হোলো এবার কুমীর? আবদুল বললে, জলের উপর তার নাকের

ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায় মনে হয় ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু মজা হোলো। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমীরটা পাঁঠার ঠ্যাং ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ঐ দানো-গিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগাল। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে। আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম তারপরে? আবদুল বললে তারপরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে। আসছে বার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব। কিন্তু আর তো সে আসেনি, হয়তো খোঁজ নিতে গেছে।

এই তো ছিল পালকির ভিতর আমার শফর, পালকির বাইরে এক একদিন ছিল আমার মাস্টারি, রেলিংগুলো আমার ছাত্র। ভয়ে থাকত চুপ। এক একটা ছিল ভারি দুষ্ট, পড়াশুনোয় কিচ্ছুই মন নেই, ভয় দেখাই যে বড়ো হোলে কুলিগিরি করতে হবে। মার খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, দুষ্টুমি

থামতে চায় না, কেননা থামলে যে চলে না খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আরো একটা খেলা ছিল সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে। পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তর বানাতে হয়েছিল, নৈলে পুজো হয় না।

সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট্ ঢুলুকুট ঢ্যাম্‌কুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খটখট খটাস
পটপট পটাস।

এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালো-বাসতুম। খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না।

৩

কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই। কেবলি চলছে বৃষ্টি। গাছগুলো বোকার মতো জবুস্থবু হয়ে

রয়েছে। পাখির ডাক বন্ধ। আজ মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলাকার সন্ধেবেলা।

তখন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে। তখনো ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে-মুখস্থর বুকধড়াস্ সন্ধেবেলার ঘাড়ে চেপে বসেনি। সেজদাদা বলতেন আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নিচে তখনো বি এ ডি ব্যাড এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয়নি।

নবাবি জবানিতে চাকর নোকরদের মহলকে তখন বলা হোত তোষাখানা। যদিও সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নিচে তবু তোষাখানা দফতরখানা বৈঠকখানা নামগুলো ছিল ভিত আঁকড়ে।

সেই তোষাখানার দক্ষিণ ভাগে বড়ো একটা ঘরে কাঁচের সেজে রেড়ির তেলে আলো জ্বলছে মিটমিট করে গণেশ মার্কা ছবি আর কালীমায়ের পট রয়েছে দেয়ালে, তারি আশেপাশে টিকটিকি রয়েছে পোকা শিকারে। ঘরে কোনো আসবাব নেই; মেজের উপরে একখানা ময়লা মাদুর পাতা।

জানিয়ে রাখি আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়ি-ঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পালকি গাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া। পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে। যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানে বরাদ্দ হোলো পাঁউরুটি আর কলাপাতা মোড়া মাখন মনে হোলো আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল। সাবেক কালের বড়োমানুষির ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল।

আমাদের এই মাতুরপাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সর্দার তার নাম ব্রজেশ্বর। চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচা-পাকা, মুখের উপর টানপড়া শুকনো চামড়া, গম্ভীর মেজাজ, কড়া গলা, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। তার পূর্ব-মনিব ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত নামডাকওয়ালা। সেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায় মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাজে। শুনেছি গ্রামের পাঠ-শালায় সে গুরুগিরি করেছে। এই গুরুমশায়ী ভাষা আর চাল ছিল তার শেষ পর্যন্ত। "বাবুরা বসে আছেন" না বলে সে বলত "অপেক্ষা করে আছেন।" শুনে মনিবরা হাসাহাসি করতেন। যেমন ছিল তার গুমোর তেমনি ছিল তার শুচিবাই। স্নানের সময় সে

পুকুরে নেমে উপরকার তেলভাসা জল দুই হাত দিয়ে পাঁচ সাতবার ঠেলে দিয়ে একেবারে ঝুপ করে দিত ডুব। স্নানের পর পুকুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গীতে হাত বাঁকিয়ে চলত যেন কোনো-মতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই তার জাত বাঁচে। চাল চলনে কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ঠিক নয় এ নিয়ে খুব ঝোঁক দিয়ে সে কথা কইত। এদিকে তার ঘাড়টা ছিল কিছু বাঁকা, তাতে তার কথার মান বাড়ত। কিন্তু ওরি মধ্যে একটা খুঁত ছিল গুরুগিরিতে। ভিতরে ভিতরে তার আহারের লোভটা ছিল চাপা। আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমতো ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত আর দেব কি। কোন্ উত্তর তার মনের মতো সেটা বোঝা যেত তার গলার সুরে। আমি প্রায়ই বলতুম, চাইনে। তারপরে আর সে পীড়াপীড়ি করত না। দুধের বাটিটার 'পরেও তার অসামাল রকমের টান ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেলফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত দুধ আর কাঠের বারকোষে লুচি তরকারি। বিড়ালের লোভ জালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়াত।

ছেলেবেলা

এমনি করে অল্প-খাওয়া আমার ছেলেবেলা থেকেই দিব্যি সয়ে গিয়েছিল। সেই কম খাওয়াতে আমাকে কাহিল করেছিল এমন কথা বলবার জো নেই। যে ছেলেরা খেতে কসুর করত না তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি বই কম ছিল না। শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত তখনো শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হোলো না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি চুল জামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুস্‌খুস্নি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায়নি। আর পেট-কামড়ানি ব'লে ভিতরে ভিতরে বদ-হজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাইনি পেটে, কেবল দরকারমতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয়নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, আচ্ছা যা মাস্টারকে জানিয়ে দে আজ আর পড়াতে হবে না। আমাদের সেকেলে মা মনে করতেন ছেলে মাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কি লোকসান। এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মাস্টারের কাছে তো ফিরে যেতেই হোত তার উপরে খেতে হোত কানমলা। হয়তো বা মুচকি হেসে গিলিয়ে দিতেন ক্যাস্টর অয়েল।

চিরকালের জন্যে আরাম হোত ব্যামোটা। দৈবাৎ কখনো আমার জ্বর হয়েছে, তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ডাক্তার, থার্মোমিটার তখন চক্ষেও দেখিনি। ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথমদিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল আর উপোষ। জল খেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গরম জল। তার সঙ্গে এলাচদানা চলতে পারত। তিন দিনের দিনই মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপোষের পরে ছিল অমৃত।

জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া ব'লে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক্-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে ফোড়াকাটা ছুরির আঁচড় পড়েনি কোনো দিন। হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানিনে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো। মায়েরা যদি ছেলেদের শরীর এতটা নীরুগী রাখতে চান যাতে মাস্টারের হাত এড়াতে না পারে তাহলে ব্রজেশ্বরের মতো চাকর খুঁজে বের করবেন। খাবার খরচার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাঁচাবে ডাক্তার খরচা; বিশেষ করে এই কলের জাঁতার ময়দা আর এই ভেজাল দেওয়া ঘি তেলের দিনে। একটা কথা মনে রাখা দরকার তখনো বাজারে চকোলেট দেখা দেয়নি। ছিল এক পয়সা

দামের গোলাপী-রেউড়ি। গোলাপী গন্ধের আমেজ দেওয়া এই তিলে ঢাকা চিনির ড্যালা আজও ছেলেদের পকেট চটচটে করে তোলে কিনা জানিনে। নিশ্চয়ই এখনকার মানী লোকের ঘর থেকে লজ্জায় দৌড় মেরেছে। সেই ভাজা মসলার ঠোঙা গেল কোথায়। আর সেই সস্তা দামের তিলে গজা ? সে কি এখনো টিঁকে আছে। না থাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই।

ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধ্যেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্জে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুরসমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা। "ওরে রে লক্ষ্মণ, একি অলক্ষণ বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।" তার মুখে হাসি, মাথায় টাক ঝক্‌ঝক্ করছে, গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরনা সুর বাজিয়ে চলছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ। সেই সঙ্গে চলত তার হাত পা নেড়ে ভাব বাৎলানো। কিশোরী চাটুজ্জের সব চেয়ে বড়ো আপশোষ ছিল এই যে দাদাভাই অর্থাৎ কিনা আমি, এমন গলা নিয়ে পাঁচালির

দলে ভরতি হোতে পারলুম না। পারলে দেশে যা-হয় একটা নাম থাকত।

রাত হয়ে আসত, মাত্বর-পাতা বৈঠক যেত ভেঙে। ভূতের ভয় শিরদাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে যেতুম বাড়ির ভিতরে মায়ের ঘরে। মা তখন তাঁর খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন। পংখের কাজ করা ঘর হাতির দাঁতের মতো চকচকে, মস্ত তক্তোপোষের উপর জাজিম পাতা। এমন উৎপাত বাধিয়ে দিতুম যে তিনি হাতের খেলা ফেলে দিয়ে বলতেন, জ্বালাতন করলে, যাও খুড়ি ওদের গল্প শোনাও গে। আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে শুরু হোত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা। মাঝখানে আমারি ঘুম ভাঙায় কে। রাতের প্রথম পহরে শেয়াল উঠত ডেকে। তখনো শেয়ালডাকা রাত কলকাতার কোনো কোনো পুরোনো বাড়ির ভিতের নিচে ফুকরে উঠত।

৪

আমরা যখন ছোটো ছিলুম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ

ছিল না। এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলী আলোর দিন। সে সময়টাতে শহরে কাজ কম কিন্তু বিশ্রাম নেই। উনুনে যেন জ্বলা কাঠ নিভেছে তবু কয়লায় রয়েছে আগুন। তেলকল চলে না, স্টীমারের বাঁশি থেমে থাকে, কারখানাঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে, পাটের গাঁটটানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নিচে শহুরে গোষ্ঠে। সমস্ত দিন যে শহরের মাথা ছিল নানা চিন্তায় তেতে আগুন, এখনো তার নাড়ীগুলো যেন দব্‌দব্‌ করছে। রাস্তার দুধারে দোকানগুলোতে কেনাবেচা তেমনি আছে, কেবল সামান্য কিছু ছাই চাপা। রকম-বেরকমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়া-গাড়ি ছুটেছে দশদিকে; তাদের দৌড়ের পিছনে গরজের ঠেলা কম। আমাদের সেকালে দিন ফুরোলে কাজকর্মের বাড়তি ভাগ যেন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ত শহরের বাতি-নেবানো নিচের তলায়। ঘরে-বাইরে সন্ধ্যার আকাশ থম্‌ থম্‌ করত। ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার ধারে শৌখিনদের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে ফেরবার গাড়িতে সইসদের হৈ হৈ শব্দ রাস্তা থেকে শোনা যেত। চৈৎ বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত "বরীফ্‌।" হাঁড়িতে বরফ দেওয়া নোনতা জলে ছোটো ছোটো টিনের চোঙে থাকত যাকে বলা

হোত কুলফির বরফ। এখন যাকে বলে আইস কিংবা আইসক্রীম। রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ডাকে মন কী রকম করত তা মনই জানে। আর একটা হাঁক ছিল "বেলফুল।" বসন্তকালের সেই মালীদের ফুলের ঝুড়ির খবর আজ নেই, কেন জানিনে। তখন বাড়িতে মেয়েদের খোঁপা থেকে বেলফুলের গড়ে মালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে। গা ধুতে যাবার আগে ঘরের সামনে বসে সমুখে হাত-আয়না রেখে মেয়েরা চুল বাধত। বিনুনি করা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরি হোত নানা কারিগরিতে। তাদের পরনে ছিল ফরাস-ডাঙার কালাপেড়ে শাড়ি পাক দিয়ে কুঁচকিয়ে তোলা। নাপতিনী আসত, ঝামা দিয়ে পা ঘষে আলতা পরাত। মেয়েমহলে তারাই লাগত খবর চালাচালির কাজে। ট্রামের পায়দানের উপর ভিড় করে কলেজ আর আপিস ফেরার দল ফুটবল খেলার ময়দানে ছুটত না। ফেরবার সময় তাদের ভিড় জমত না সিনেমা হলের সামনে। নাটক অভিনয়ের একটা ফুর্তি দেখা দিয়েছিল কিন্তু, কী আর বলব, আমরা সে সময়ে ছিলুম ছেলেমানুষ।

তখন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না। যদি সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তাহলে শুনতে হোত যাও খেলা করো গে। অথচ

ছেলেরা খেলায় যদি উচিত মতো গোল করত তাহলে শুনতে হোত চুপ করো। বড়োদের আমোদ আহ্লাদ সব সময় খুব যে চুপচাপে সারা হোত তা নয়। তাই দূর থেকে কখনো কখনো ঝরনার ফেনার মতো তার কিছু কিছু পড়ত ছিটকিয়ে আমাদের দিকে। এ বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম, দেখতুম, ও-বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময়। দেউড়ির সামনে বড়ো বড়ো জুড়ি গাড়ি এসে জুটেছে। সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গোলাপপাস থেকে গায়ে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন হাতে দিচ্ছেন ছোটো একটি করে তোড়া। নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনো কখনো কানে আসে, তার মর্ম বুঝতে পারিনে। বোঝবার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। খবর পেতুম যিনি কাঁদতেন তিনি কুলীন বটে কিন্তু তিনি আমার ভগ্নীপতি। তখনকার পরিবারে যেমন মেয়ে আর পুরুষ ছিল দুই সীমানায় দুই দিকে, তেমনি ছিল ছোটোরা আর বড়োরা। বৈঠকখানায় ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় চলছে নাচগান, গুড়গুড়ি টানছেন বড়োর দল, মেয়েরা লুকনো থাকতেন ঝরোখার ওপারে চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে, সেখানে বাইরের মেয়েরা এসে জমতেন, ফিসফিস করে চলত গেরস্তালির খবর।

ছেলেরা তখন বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে—

"জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে"—

৫

আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী ঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এই রকম একটি শখের দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলা দেশের ছিল ভারি নেশা। এ পাড়ায় ও পাড়ায় এক একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো কিংবা লেখাপড়ায় এমন কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায়। আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নাই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়যন্তর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারিদিকে উঠছে তামাকের ধোঁয়া, ছেলেগুলো লম্বা চুলওয়ালা, চোখে

কালীপড়া, অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে। পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রং করা টিনের বাক্সোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল পিল করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চারদিকে টগবগ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়। রাত্রি হবে নটা, পায়রার পিঠের উপর বাজপাখির মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম, কড়া পড়া শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধরে বলে মা ডাকছে, চলো শোবে চলো। লোকের সামনে এই টানাহেঁচড়ায় মাথা হেঁট হয়ে যেত, হার মেনে চলে যেতুম শোবার ঘরে। বাইরে চলছে হাঁক ডাক, বাইরে জ্বলছে ঝাড়লণ্ঠন, আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই, পিলসুজের উপর টিমটিম করছে পিতলের প্রদীপ। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল শমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল।

সব তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধম কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরোল ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নল-দময়ন্তীর পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে। বারবার ভরসা দেওয়া হোলো সময় হোলেই আমাদের জাগিয়ে দেবে।

উপরওয়ালাদের দস্তুর জানি, কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, কেননা তাঁরা বড়ো আমরা ছোটো।

সে রাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা কারণ, মা বললেন তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন আর একটা কারণ নটার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে বেশ একটু ঠেলাঠেলির দরকার হোত। এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হোলো বাইরে। চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল। একতলায় দোতলায় রঙিন ঝাড়লণ্ঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চারদিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা চোখে ঠেকছে মস্ত। একদিকে বসে আছেন বাড়ির কর্তারা আর যাঁদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকি জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে। থিয়েটরে এসেছিলেন পেটে সোনার চেন ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্দর-লোকেরা যাদের বলে বাজে লোক। তেমনি আবার পালা-গানটা লেখানো হয়েছে এমন সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপি বুকের মক্সো করেনি। এর সুর এর নাচ এর সব গল্প বাংলা দেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা করা, এর ভাষা পণ্ডিত মশায় দেননি পালিশ করে।

সভায় যখন দাদাদের কাছে এসে বসলুম রুমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা আর গৃহস্থের ছিল খোষনাম।

রাত ফুরোত যাত্রা ফুরোতে চাইত না। মাঝখানে নেতিয়ে পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারিনি। জানতে পারলে সে কি কম লজ্জা, যে মানুষ বড়োদের সমান সারে বসে বকশিষ দিচ্ছে ছুঁড়ে, উঠোন সুদ্ধ লোকের সামনে তাকে কি না এমন অপমান। ঘুম যখন ভাঙল দেখি মায়ের তক্ত-পোষে শুয়ে আছি। বেলা হয়েছে বিস্তর, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। সূর্য উঠে গেছে অথচ আমি উঠিনি এ ঘটেনি আর কোনো দিন।

শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো। মাঝে মাঝে তার ফাঁক নেই। রোজই যেখানে সেখানে যখনতখন সিনেমা, যে খুশি ঢুকে পড়ছে সামান্য খরচে। সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ দুকোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।

আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুত্তুর। মাঝে

৪

মাঝে পাল পার্বণে যখন মর্জি হোত আপন এলেকায় করত দান খয়রাৎ। এখনকার কাল সদাগরের পুত্তুর, হরেক রকমের ঝকঝকে মাল সাজিয়ে বসেছে সদর রাস্তার চৌমাথায়। বড়ো রাস্তা থেকে খদ্দের আসে, ছোটো রাস্তা থেকেও।

৬

চাকরদের বড়ো কর্তা ব্রজেশ্বর। ছোটো কর্তা যে ছিল তার নাম শ্যাম। বাড়ি যশোরে, খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতায়ী নয়। সে বলত, তেনারা ওনারা, খাতি হবে যাতি হবে, মুগির ডাল কুলির আম্বল। দোমনি ছিল তার আদরের ডাক। তার রং ছিল শ্যাম বর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেল চুক্‌চুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের পরে তার ছিল দরদ। তার কাছে আমরা ডাকাতের গল্প শুনতে পেতুম। তখন ভূতের ভয় যেমন মানুষের মন জুড়ে ছিল তেমনি ডাকাতের গল্প ছিল ঘরে ঘরে। ডাকাতি এখনো কম হয় না, খুনও হয় জখমও হয় লুঠও হয়, পুলিশও ঠিক লোককে ধরে না। কিন্তু এ হোলো খবর, এতে গল্পের মজা

নেই। তখনকার ডাকাতি গল্পে উঠেছিল দানা বেঁধে, অনেকদিন পর্যন্ত মুখে মুখে চারিয়ে গেছে। আমরা যখন জন্মেছি তখনো এমন সব লোক দেখা যেত যারা সমর্থ বয়সে ছিল ডাকাতের দলে। মস্ত মস্ত সব লাঠিয়াল, সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলার সাক্রেদ। তাদের নাম শুনলেই লোকে সেলাম করত। প্রায়ই ডাকাতি তখন গোঁয়ারের মতো নিছক খুনখারাবির ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা তেমনি দরাজ মন। এদিকে ভদ্রলোকের ঘরেও লাঠি দিয়ে লাঠি ঠেকাবার আখড়া বসে গিয়েছিল। যারা নাম করেছিল ডাকাতরাও তাদের মানত ওস্তাদ বলে, এড়িয়ে চলত তাদের সীমানা। অনেক জমিদারের ডাকাতি ছিল ব্যবসা। গল্প শুনেছি সেই জাতের একজন, দল বসিয়ে রেখেছিল নদীর মোহানায়। সেদিন অমাবস্যা, পুজোর রাত্তির, কালী কঙ্কালীর নামে মুণ্ড কেটে মন্দিরে যখন নিয়ে এল, জমিদার কপাল চাপড়ে বললে, এ যে আমারই জামাই।

আরো শোনা যেত রঘু ডাকাত বিশু ডাকাতের কথা। তারা আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করত ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার রক্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্মে ছিল মানা। একবার একজন মেয়ে

খাঁড়া হাতে কালী সেজে উল্‌টে ডাকাতের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেছিল।

আমাদের বাড়িতে একদিন ডাকাতের খেলা দেখানো হয়েছিল। মস্ত মস্ত কালো কালো জোয়ান সব, লম্বা লম্বা চুল। ঢেঁকিতে চাদর বেঁধে সেটা দাঁতে কামড়ে ধরে দিলে ঢেঁকিটা টপকিয়ে পিঠের দিকে। ঝাঁকড়া চুলে মানুষ ঝুলিয়ে লাগল ঘোরাতে। লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল দোতলায়। একজনের দুই হাতের ফাঁক দিয়ে পাখির মতো সুট করে বেরিয়ে গেল। দশবিশ কোশ দূরে ডাকাতি সেরে সেই রাত্রেই ভালো মানুষের মতো ঘরে ফিরে এসে শুয়ে থাকা কেমন করে হোতে পারে তাও দেখালে। খুব বড়ো একজোড়া লাঠির মাঝখানে আড় করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁধা। এই লাঠিকে বলে রণপা। দুই হাতে দুই লাঠির আগা ধরে সেই পাদানের উপর পা রেখে চললে এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হোত, ঘোড়ার চেয়ে দৌড় হোত বেশি। ডাকাতি করবার মতলব যদিও মাথায় ছিল না তবু এক সময়ে এই রণ-পায়ে চলার অভ্যাস তখনকার শান্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। ডাকাতি খেলার এই ছবি শ্যামের মুখের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সন্ধে কাটিয়েছি দুহাতে পাঁজর চেপে ধরে।

ছেলেবেলা

ছুটির রবিবার। আগের সন্ধেবেলায় ঝিঁঝিঁ ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিটমিটে আলোতে বুক করছিল ধুক ধুক। পরদিন ছুটির ফাঁকে পালকিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায়, উড়ো ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। নিঝুম অন্ধকারের নাড়ীতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাগুলোর হাঁই হুই, হাঁই হুই, গা করছে ছমছম। ধূধূ করে মাঠ, বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে। দূরে ঝিকঝিক করে কালি দীঘির জল। চিক চিক করে বালি। ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটলধরা ঘাটের দিকে ডালপালা ছড়ানো পাকুড় গাছ।

গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায়, ঘন বেতের ঝোপে। যত এগোচ্ছি দুর দুর করছে বুক। বাঁশের লাঠির আগা দুই একটা দেখা যায় ঝোপের উপর দিকে। কাঁধ বদল করবে বেহারা-গুলো ঐখানে। জল খাবে, ভিজে গামছা জড়াবে মাথায়। তারপরে ?

রে রে রে রে রে রে।

৭

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতা কল চলছেই। ঘর্ঘর শব্দে এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা। তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই ডিঙি উলটিয়ে তলিয়ে গেছে এ কথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল। সেজদাদা তাঁর বড়ো মেয়েকে শিখিয়ে তুলতে লেগেছিলেন। যথাসময়ে তাকে দিয়েছিলেন লোরেটোতে ভরতি করে। তার পূর্বেই তার ভাষায় প্রথম দখল হয়ে গেছে বাংলায়।

প্রতিভাকে বিলিতি সংগীতে পাকা করে তুললেন। তাতে করে তাকে দিশি গানের পথ ভুলিয়ে দেওয়া হয়নি সে আমরা জানি। তখনকার দিনে ভদ্র পরিবারে হিন্দুস্থানী গানে তার সমান কেউ ছিল না।

বিলিতি সংগীতের গুণ হচ্ছে তাতে সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে, কান দোরস্ত হয়ে যায়, আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না।

এদিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশু-কাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভরতি হোতে হোলো। বিষ্ণু যে গানে হাতে খড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নিচের তলায়। তুই একটা নমুনা দিই ঃ—

এক যে ছিল বেদের·মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে।
আবার উল্কি পরা যেমন তেমন
লাগিয়ে দিল ভেলকি
ঠাকুর ঝি,
উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি
ঠাকুর ঝি।

আরো কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে, যেমন—

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে জোনাক জ্বালে বাতি
মোগল পাঠান হদ্দ হোলো
ফার্সি পড়ে তাঁতি।

“গণেশের মা, কলাবৌকে জ্বালা দিয়ো না,
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানা পোনা।

অতি পুরোনো কালের ভুলে যাওয়া খবরের আমেজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায়, যেমন—

এক যে ছিল কুকুরচাটা
শেয়ালকাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে হারমোনিয়মে সুর লাগিয়ে সা রে গা মা সাধানো, তার পরে হালকা গোছের হিন্দিগান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন তিনি বুঝেছিলেন, ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর ঐ হালকা বাংলা ভাষা হিন্দি বুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তা ছাড়া এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না। আপনা আপনি নাড়ীতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায় এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।

তখন হার্মোনিয়ম আসে নি এদেশের গানের জাত মারতে। কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি। কল-টেপা সুরের গোলামি করিনি।

আমার দোষ হচ্ছে শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছে মতো কুড়িয়ে

বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তাহলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন "অতি গজ গামিনীরে" আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। সন্ধে-বেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল। আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠ বাবু দিন রাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন, হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, গুন্‌গুন্‌ গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চারদিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল করত, গান ধরতেন,—

ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী,

সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।

তখনকার আতিথ্য ছিল খোলা দরজার। চেনা-শোনার খোঁজ খবর নেবার বিশেষ দরকার ছিল না। যারা যখন এসে পড়ত তাদের শোবার জায়গাও মিলত, অন্নের থালাও আসত যথানিয়মে। সেই রকমের অচেনা অতিথি একদিন লেপমোড়া তম্বুরা কাঁধে করে তাঁর পুটুলি খুলে বসবার ঘরের একপাশে পা ছড়িয়ে দিলেন। কানাই হুঁকোবরদার যথারীতি তাঁর হাতে দিলে হুঁকো তুলে। সেকালে ছিল অতিথির জন্যে এই যেমন তামাক তেমনি পান। তখনকার দিনে বাড়ি ভিতরে মেয়েদের সকাল বেলাকার কাজ ছিল ঐ, পান সাজতে হোত রাশি রাশি, বাইরের ঘরে যারা আসত তাদের উদ্দেশে। চটপট পানে চুন লাগিয়ে কাঠি দিয়ে খয়ের লেপে ঠিকমতো মসলা ভরে লঙ্গ দিয়ে মুড়ে সেগুলো বোঝাই হোতে থাকত পিতলের গামলায়, উপরে পড়ত খয়েরের ছোপলাগা ভিজে ন্যাকড়ার ঢাকা। ওদিকে বাইরে সিঁড়ির নিচের ঘরটাতে চলত তামাক সাজার ধুম। মাটির গামলায় ছাই-ঢাকা গুল, আলবোলার নলগুলো ঝুলছে নাগলোকের সাপের মতো, তাদের নাড়ীর মধ্যে গোলাপ জলের গন্ধ। বাড়িতে যাঁরা আসতেন সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে তাঁরা গৃহস্থের প্রথম আসুন মশায় ডাক পেতেন এই অম্বুরি তামাকের গন্ধে। তখন এই একটা বাঁধা নিয়ম ছিল মানুষকে মেনে

নেওয়ার। সেই ভরপুর পানের গামলা অনেকদিন হোলো সরে পড়েছে, আর সেই হুঁকোবরদার জাতটা সাজ খুলে ফেলে ময়রার দোকানে তিন দিনের বাসি সন্দেশ চটকে চটকে মাখতে লেগেছে।

সেই অজানা গাইয়ে আপন ইচ্ছে মতো রয়ে গেলেন কিছুদিন। কেউ প্রশ্নও করলে না। ভোর বেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শখ অনিয়মের শেখায়। সকাল বেলার সুরে চলত "বঙশী হমারি রে।"

তারপরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদু ভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই, সেইজন্যে গান শেখাই হোলো না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে চুরিয়ে—ভালো লাগল কাফি সুরে, রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া, রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে। মুশকিল হোলো, এই সময়ে আর এক অতিথি হাজির হোলো কিছু না ব'লে কয়ে। বাঘ মারা ব'লে তাঁর খ্যাতি। বাঙালী বাঘ মারে এ কথাটা সেদিন শোনাত খুব অদ্ভুত, কাজেই বেশির ভাগ সময় আটকা পড়ে গেলুম তাঁরি ঘরে। যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন ব'লে আমাদের বুকে চমক লাগিয়েছিলেন সে বাঘের মুখ

থেকে তিনি কামড় পাননি, কামড়ের গল্পটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন মিউজিয়মে মরা বাঘের হাঁ থেকে, তখন সে কথা ভাবিনি এখন সেটা পষ্ট বুঝতে পারছি। তবু তখনকার মতো ঐ বীরপুরুষের জন্য ঘন ঘন পান-তামাকের জোগাড় করতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। দূর থেকে কানে পৌঁছত কানাড়ার আলাপ।

এই তো গেল গান। সেজদাদার হাতে আমার অন্য বিদ্যের যে গোড়াপত্তন হয়েছিল সেও খুব ফলাও রকমের। বিশেষ কিছু ফল হয়নি সে স্বভাব দোষে। আমার মতো মানুষকে মনে রেখেই রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন, মন তুমি কৃষিকাজ বোঝো না। কোনো-দিন আবাদের কাজ করা হয়নি।

চাষের আঁচড় কাটা হয়েছিল কোন্ কোন্ ক্ষেতে তার খবরটা দেওয়া যাক।

অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শির শির ক'রে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাক্-সাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত। দালান ঘরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি, তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। নাম শুনে বোঝা যায় শহর একদিন পাড়াগাঁটাকে আগাগোড়া চাপা দিয়ে বসেনি, কিছু কিছু

ফাঁক ছিল। শহুরে সভ্যতার শুরুতে আমাদের গোলা-বাড়ি গোলা ভরে বছরের ধান জমা করে রাখত, খাস জমির রায়ৎরা দিত তাদের ধানের ভাগ। এই পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কুস্তির চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা ক'রে তাতে এক মোন শর্ষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাঁচ কষা ছিল ছেলে-খেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি ক'রে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম। সকাল বেলায় রোজ এত ক'রে মাটি ঘেঁটে আসা ভালো লাগত না মায়ের, তাঁর ভয় হোত ছেলের গায়ের রঙ মেটে হয়ে যায় পাছে। তার ফল হয়েছিল ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতে। এখনকার কালের শৌখিন গিন্নিরা রং সাফ করবার সরঞ্জাম কৌটোতে করে কিনে আনেন বিলিতি দোকান থেকে, তখন তাঁরা মলম বানাতেন নিজের হাতে। তাতে ছিল বাদাম-বাটা, সর, কমলা-লেবুর খোসা, আরো কত কী, যদি জানতুম আর মনে থাকত তবে বেগম-বিলাস নাম দিয়ে ব্যবসা করলে সন্দেশের দোকানের চেয়ে কম আয় হোত না। রবিবার দিন সকালে বারান্দায় বসিয়ে দলন মলন চলতে থাকত, অস্থির হয়ে উঠত মন ছুটির জন্যে। এদিকে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে একটা গুজব চলে আসছে যে জন্মমাত্র আমাদের বাড়িতে

শিশুদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে, তাতেই রংটাতে সাহেবি জেল্লা লাগে।

কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবার জন্যে। দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কঙ্কাল। রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এটা ঝুলত, হাওয়ায় নাড়া খেলে হাড়গুলো উঠত খটখট করে। তাদের নাড়াচাড়া ক'রে ক'রে হাড়গুলোর শক্ত শক্ত নাম সব জানা হয়েছিল, তাতেই ভয় গিয়েছিল ভেঙে।

দেউড়িতে বাজল সাতটা। নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি ধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাৎ হবার জো ছিল না। খটখটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, একদিনের জন্যেও মাথা ধরার সুযোগ ঘটল না। বই নিয়ে শ্লেট নিয়ে যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত, সবই বাংলায়, পাটিগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাহিত্যে সীতার বনবাস থেকে একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যে। সঙ্গে ছিল প্রাকৃত-বিজ্ঞান। মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত, বিজ্ঞানের ভাসা ভাসা খবর পাওয়া যেত জানা জিনিস পরখ করে। মাঝে একবার এলেন হেরম্ব তত্ত্বরত্ন। লাগলুম কিছু না বুঝে

মুগ্ধবোধ মুখস্থ করে ফেলতে। এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানা রকম পড়ার যতই চাপ পড়ে মন ততই ভিতরে ভিতরে চুরি ক'রে কিছু কিছু বোঝা সরাতে থাকে, জালের মধ্যে ফাঁক ক'রে তার ভিতর দিয়ে মুখস্থ বিদ্যে ফসকিয়ে যেতে চায়, আর নীলকমল মাস্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো হয় না।

বারান্দার আর একধারে বুড়ো দর্জি, চোখে আতস কাঁচের চশমা, ঝুঁকে পড়ে কাপড় সেলাই করছে, মাঝে মাঝে সময় হোলে নমাজ পড়ে নিচ্ছে, চেয়ে দেখি আর ভাবি কী সুখেই আছে নেয়ামৎ। অঙ্ক কষতে মাথা যখন ঘুলিয়ে যায়, চোখের উপর শ্লেট আড়াল করে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান, লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলছে দুই কানের উপর দুইভাগে। পাশে বসে আছে কাঁকন-পরা ছিপছিপে ছোকরা দরোয়ান, কুটছে তামাক। ঐখানে ঘোড়াটা সকালেই খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে পড়া ছোলা, জনি কুকুরটার কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে, ঘেউ ঘেউ করে দেয় তাড়া।

বারান্দায় এককোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর

মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বীচি। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরবে দেখবার জন্যে মন ছটফট করছে। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই; আর দেওয়া চাই জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটেনি। যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় হেলে পড়ে ছায়া। ন'টা বাজে। বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে। সাড়ে ন'টা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল ভাত মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ। রুচি হয় না খেতে।

ঘণ্টা বাজে দশটার। বড়ো রাস্তা থেকে মন-উদাস করা ডাক শোনা যায় কাঁচা আমওয়ালার। বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলছে দূরের থেকে দূরে। গলির ধারের বাড়ির ছাদের বড়ো বউ ভিজে চুল শুকোচ্ছে রোদ্দুরে, তার দুই মেয়ে কড়ি নিয়ে খেলেই চলেছে, কোনো তাড়া নেই। মেয়েদের তখন ইস্কুল যাওয়ার তাগিদ ছিল না। মনে হোত মেয়ে জন্মটা নিছক সুখের। বুড়ো ঘোড়া পালকি গাড়িতে করে টেনে নিয়ে চলল আমার দশটা চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে। জিমনাস্টিকের মাস্টার

এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলটপালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি আঁকার মাস্টার।

ক্রমে দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে। শহরের পাঁচমিশালি ঝাপসা শব্দে স্বপ্নের সুর লাগায় ইটকাঠের দৈত্যটার দেহে।

পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীডার যেন ওৎ পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা ঢলঢলে, পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগী, অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে, তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি। বিছানায় ঢুকে এতক্ষণ পরে পাওয়া যায় একটুখানি পোড়ো সময়। সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হোতে পায় না রাজপুত্তুর চলেছে তেপান্তর মাঠে।

৮

তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাৎ ঘটেছে একথা স্পষ্ট বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই

আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা না আছে ভূতপ্রেতের। পূর্বেই জানিয়েছি অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিঁকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়। ছাদের কার্নিসে তার আরামে পা রাখবার গুজব উঠে গিয়ে সেখানে এঁঠো আমের আঁঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছেঁড়ি। এদিকে মানুষের বসতি আটক পড়েছে নিচের তলায় চারকোণা দেয়ালের প্যাকবাক্সে।

মনে পড়ে বাড়ি ভিতরের পাঁচিল ঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সন্ধেবেলায় মাতুর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চার-দিকে ঘিরে বসে গল্প করছে। সেই গল্পে খাঁটি খবরের দরকার ছিল না। দরকার কেবল সময় কাটানো। তখনকার দিনের সময় ভরতি করবার জন্যে নানা দামের নানা মালমশলার বরাদ্দ ছিল না। দিন ছিল না ঠাসবুনুনি করা, ছিল বড়ো বড়ো ফাঁকওয়ালা জালের মতো। পুরুষদের মজলিশেই হোক, আর মেয়েদের আসরেই হোক, গল্প গুজব হাসি তামাশা ছিল খুবই হালকা দামের। মায়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ব্রজ আচার্জির বোন যাঁকে আচার্জিনী ব'লে ডাকা হোত। তিনি ছিলেন এ বৈঠকে দৈনিক খবর সরবরাহ করবার কাজে। প্রায় আনতেন রাজ্যির বিদকুটে খবর কুড়িয়ে কিংবা বানিয়ে। তাই নিয়ে গ্রহ শান্তি স্বস্ত্যয়নের

হিসেব হোত খুব ফলাও খরচার। এই সভায় আমি মাঝে মাঝে টাটকা পুঁথি পড়া বিদ্যের আমদানি করেছি, শুনিয়েছি সূর্য পৃথিবীর থেকে ন'কোটি মাইল দূরে। ঋজু পাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বয়ং বাল্মীকি রামায়ণের টুকরো আউড়ে দিয়েছি অনুস্বার বিসর্গ সুদ্ধ, মা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাঁটি, তবু তার বিদ্যের পাল্লা সূর্যের ন'কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ সব শ্লোক স্বয়ং নারদ মুনি ছাড়া আর কারো মুখে শোনা যেতে পারে এ কথা কে জানত বলো।

বাড়ি ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোঝাপাড়া। ওখানে রোদ পড়ত পূরোপূরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ঐখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাঁটা নিয়ে। টিপে টিপে টপটপ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে; দাসীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে। তখন অনেকটা হালকা ছিল ধোবার কাজ। কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকোনো হোত, ছোটো বড়ো নানা সাইজের নানা কাজ করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হোত, রোদ খাওয়া শর্ষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার। কেয়া

খয়ের তৈরি হোত সাবধানে, তার কথাটা আমার বেশি করে মনে রাখবার মানে আছে। যখন ইস্কুলের পণ্ডিত মশায় আমাকে জানিয়ে দিলেন আমাদের বাড়ির কেয়া খয়েরের নাম তাঁর শোনা আছে অর্থ বুঝতে শক্ত ঠেকল না। যা তাঁর শোনা আছে সেটা তাঁর জানা চাই। তাই বাড়ির সুনাম বজায় রাখবার জন্য মাঝে মাঝে লুকিয়ে ছাদে উঠে ছুটো একটা কেয়া খয়ের— কী বলব। চুরি করতুম বলার চেয়ে বলা ভালো অপহরণ করতুম। কেননা রাজা মহারাজারাও দরকার হোলে, এমন কি না হোলেও অপহরণ করে থাকেন আর যারা চুরি করে তাদের জেলে পাঠান শূলে চড়ান। শীতের কাঁচা রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর, বৌদিদির আমসত্ত পাহারা, তা ছাড়া আরো পাঁচ রকম খুচরো কাজের সাথী। পড়ে শোনাতুম বঙ্গাধিপ পরাজয়। কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল, সে কথা কিছুতেই বৌঠাকরুন মানতেন না, এমন কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার সুপুরিকাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে

মুখে বাধত না। তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড় বেগে। উসকিয়ে দেবার লোক না থাকাতে সরু করে সুপুরি কাটার হাত অনেকদিন থেকে অন্য সরু কাজে লাগিয়েছি।

ছাদে মেলে দেওয়া এই সব মেয়েলি কাজে পাড়াগাঁয়ের একটা স্বাদ ছিল। এই কাজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল, যখন হোত নাড়ুকোটা, যখন দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকৌড়ির নেমন্তন্নে। রূপকথা আজকাল ছেলেরা মেয়েদের মুখ থেকে শুনতে পায় না, নিজে নিজে পড়ে ছাপানো বই থেকে। আচার চাটনি এখন কিনে আনতে হয় নতুন বাজার থেকে বোতলে ভরা গালা দিয়ে ছিপিতে বন্ধ।

পাড়াগাঁয়ের আরো একটা ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে। ঐখানে গুরু মশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয় পাড়া প্রতিবেশীর ছেলেদেরও ঐখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়। আমিও নিশ্চয় ঐখানেই স্বরে অ স্বরে আ-র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সৌর লোকের সব চেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে আনাওয়ালা কোনো দূরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই।

তারপরে বই পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ অবতার, বোধ করি সীসের ফলকে খোদাইকরা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক।

আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন ঐ ছাদে নানাভাবে বয়ে চলেছে। আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতালার ঘরে। চিলে কোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কতদিন দেখেছি, তখনো সূর্য ওঠেনি, তিনি সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন, কোলে দুটি হাত জোড় করা। মাঝে মাঝে তিনি অনেক দিনের জন্য চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে তখন ঐ ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাতসমুদ্দুর পারে যাওয়ার আনন্দ। চিরদিনের নিচে তলায় বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি রাস্তার লোক চলা-চল; কিন্তু ঐ ছাদের উপর যাওয়া লোকবসতির পিল্‌পেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া। ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায় যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে।

নানা বাড়ির নানা গড়নের উঁচুনিচু ছাদ চোখে ঠেকে, মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গাছের ঝাঁকড়া মাথা। আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায়। বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমাব মন ভুলিয়ে। ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগী হয়ে যাবার সময়। খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে ঘরের ছিট্‌কিনি দিতুম খুলে। দরজার ঠিক সামনেই ছিল একটা সোফা ; সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম। আমাকে পাকড়া করবার চৌকিদার যারা, পেট ভরে খেয়ে তাদের ঝিমুনি এসেছে, গা মোড়া দিতে দিতে শুয়ে পড়েছে মাদুর জুড়ে। রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা। সেদিনকার দুপুরবেলাকার সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই, আর নেই সেই চুপচাপ বেলার ফেরিওয়ালা।

হঠাৎ তাদের হাঁক পৌঁছত, যেখানে বালিশের উপর খোলাচুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বৌ, দাসী ডেকে নিয়ে আসত ভিতরে, বুড়ো চুড়িওয়ালা কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত পছন্দমতো বেলোয়াড়ি চুড়ি। সেদিনকার সেই বৌ আজকের দিনে এখনো বৌ-এর পদ পায়নি, সেকেণ্ড ক্লাসে সে পড়া মুখস্থ করছে। আর সেই চুড়িওয়ালা হয়তো আজ সেই গলিতেই

বেড়াচ্ছে রিক্‌শ ঠেলে। ছাদটা ছিল আমার কেতাবে পড়া মরুভূমি, ধুধু করছে চারদিক। গরম বাতাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, আকাশের নীল রং এসেছে ফিকে হয়ে।

এই ছাদের মরুভূমিতে তখন একটা ওয়েসিস দেখা দিয়েছিল। আজকাল উপরের তলায় কলের জলের নাগাল নেই। তখন তেতালার ঘরেও তার দৌড় ছিল। লুকিয়ে ঢোকা নাবার ঘর, তাকে যেন বাংলা দেশের শিশু লিভিংস্টন এইমাত্র খুঁজে বের করলে। কল দিতুম খুলে, ধারা জল পড়ত সকল গায়ে। বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মানুষ হয়ে বসতুম।

ছুটির দিনটা দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পৌঁছল। নিচের দেউড়ির ঘণ্টায় বাজল চারটে। রবিবারের বিকেল বেলায় আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ বিগড়ে আছে। আসছে সোমবারের হাঁ-করা মুখের গ্রহণ লাগানো ছায়া তাকে গিলতে শুরু করেছে। নিচে এতক্ষণে পাহারা-এড়ানো ছেলের খোঁজ পড়ে গেছে।

এখন জলখাবারের সময়। এইটে ছিল ব্রজেশ্বরের একটা লাল-চিহ্ন দেওয়া দিনের ভাগ। জলখাবারের বাজার করা ছিল তারি জিম্মায়। তখনকার দিনে দোকানীরা ঘিয়ের দামে শতকরা ত্রিশ চল্লিশ টাকা হারে মুনফা রাখত না, গন্ধে স্বাদে জলখাবার তখনো

বিষিয়ে ওঠেনি। যদি জুটে যেত কচুরি সিঙ্গাড়া এমন কি আলুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না। কিন্তু যথাসময়ে ব্রজেশ্বর যখন তার বাঁকা ঘাড় আরো বাঁকিয়ে বলত "দেখো বাবু আজ কী এনেছি" প্রায় দেখা যেত কাগজের ঠোঙায় চীনে বাদাম ভাজা। সেটাতে আমাদের যে রুচি ছিল না তা নয়, কিন্তু ওর দরের মধ্যেই ছিল ওর আদর। কোনোদিন টুঁ শব্দ করিনি। এমন কি, যেদিন তাল পাতার ঠোঙা থেকে বেরত তিলে গজা সেদিনও না।

দিনের আলো আসছে ঘোলা হয়ে। মন খারাপ নিয়ে একবার ছাদটা ঘুরে আসা গেল, নিচের দিকে দেখলুম তাকিয়ে, পুকুর থেকে পাঁতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে। লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে ঘাটে, বটগাছের ছায়া পড়েছে অর্ধেক পুকুর জুড়ে, রাস্তা থেকে জুড়িগাড়ির সইসের হাঁক শোনা যাচ্ছে।

৯

দিনগুলো এমনি চলে যায় একটানা। দিনের মাঝখানটা ইস্কুল নেয় খাবলিয়ে, সকালে বিকেলে ছিটকিয়ে পড়ে তারি বাড়তির ভাগ। ঘরে ঢুকতেই ক্লাসের বেঞ্চি টেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুকনো

কনুইয়ের গুঁতো মারে। রোজই তাদের একই আড়ষ্ট চেহারা।

সন্ধেবেলায় ফিরে যেতুম বাড়িতে। ইস্কুল ঘরে তেলের বাতিটা তুলে ধরেছে পরদিনের পড়া তৈরি পথের সিগন্যাল। এক একদিন বাড়ির আঙিনায় আসে ভালুক-নাচওয়ালা। আসে সাপুড়ে সাপ খেলাতে। এক একদিন আসে ভোজবাজিওয়ালা, একটু দেয় নতুনের আমেজ।

আমাদের চিৎপুর রোডে আজ আর ওদের ডুগডুগি বাজে না। সিনেমাকে দূর থেকে সেলাম করে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। শুকনো পাতার সঙ্গে এক জাতের ফড়িং যেমন বেমালুম রং মিলিয়ে থাকে আমার প্রাণটা তেমনি শুকনো দিনের সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে থাকত।

তখন খেলা ছিল সামান্য কয়েক রকমের। ছিল মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটবল, ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুটুম্ব। আর ছিল লাঠিম ঘোরানো, ঘুড়ি ওড়ানো, শহরে ছেলেদের খেলা সবই ছিল এমনি কম্‌জোরি। মাঠজোড়া ফুটবলখেলার লম্ফঝম্প তখনো ছিল সমুদ্রপারে। এমনি করে একই মাপের দিনগুলো শুকনো খুঁটির বেড়া পুঁতে চলেছিল আমাকে পাকে পাকে ঘিরে।

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বৌ কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।

দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর কোঠায়। নবাবী কায়দা তখনো চলে আসছে। মনে আছে দিদি বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বৌকে পাশে নিয়ে, মনের কথা বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগকাটা গণ্ডির বাইরের। আবার শুকনো মুখ করে ফিরতে হবে সেই ছ্যাৎলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।

হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক বাঁধের তলা ক্ষইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল। বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী। বৌঠাকরুনের জায়গা হোলো বাড়ি ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরি হোলো পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলে-

মানুষ। বৌঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানতা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয় বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটি জুতো জোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা কোনো দামী জিনিস লুকিয়ে রেখে, ঝগড়ার পত্তন করতুম। বলতে হোত, তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে। আমি কি চৌকিদার। তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না নিজের হাত সামলিয়ো।

একালের মেয়েদের হাসি পাবে, তাঁরা বলবেন নিজের ছাড়া সংসারে কি পরের দেওর ছিল না কোনোখানে। কথাটা মানি। এখনকার কালের বয়স সকল দিকেই তখনকার থেকে হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে! তখন বড়ো ছোটো সবাই ছিল ছেলেমানুষ।

এইবার আমার নির্জন বেদুয়িনী ছাদে শুরু হোলো আর এক পালা, এল মানুষের সঙ্গ মানুষের স্নেহ। সেই পালা জমিয়ে দিলেন আমার জ্যোতিদাদা।

১০

ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল নামল নতুন ঋতু।

তখন পিতৃদেব জোড়াসাঁকোয় বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা এসে বসলেন বাইরের তেতলার ঘরে। আমি একটু জায়গা নিলুম তারি একটি কোণে।

অন্দর মহলের পর্দা রইল না। আজ একথা নতুন ঠেকবে না কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার থই পাওয়া যায় না। তারো অনেককাল আগে, আমি তখন শিশু, মেজদাদা সিভিলিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বৌঠাকরুনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বৌকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই এ যে হোলো বিষম বেদস্তুর। আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাইরে বেরবার মতো কাপড় তখনো মেয়েদের মধ্যে চলতি হয়নি। এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে তারি প্রথম শুরু করেছিলেন বৌঠাকরুন।

বেণী দুলিয়ে তখনো ফ্রক ধরেনি ছোটো মেয়েরা। অন্তত আমাদের বাড়িতে। ছোটোদের মধ্যে চলন ছিল পেশোয়াজের। বেথুন ইস্কুল যখন প্রথম খোলা হোলো আমার বড়দিদির ছিল অল্প বয়স। সেখানে মেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করবার প্রথম দলের ছিলেন তিনি। ধবধবে তাঁর রঙ। এদেশে তার তুলনা পাওয়া যেত না। শুনেছি পালকিতে করে স্কুলে যাবার সময় পেশোয়াজপরা তাঁকে চুরি করা ইংরেজ মেয়ে মনে করে পুলিশে একবার ধরেছিল।

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু এই সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো। বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য এই যে তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি ব'লে কখনো আমার মুখচাপা দেননি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয়নি। আজ ছেলেদের মধ্যেই আমার বাস। পাঁচ রকম কথা পাড়ি, দেখি তাদের মুখ বোজা। জিজ্ঞেসা করতে এদের বাধে। বুঝতে পারি এরা সব সেই বুড়োদের কালের ছেলে, যে কালে বড়োরা কইত কথা আর ছোটোরা থাকত বোবা।

জিজ্ঞাসা করবার সাহস নতুন কালের ছেলেদের; আর বুড়োকালের ছেলেরা সব কিছু মেনে নেয় ঘাড় গুঁজে।

ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। আর এল একালের বার্নিশ করা বৌবাজারের আসবাব। বুকের ছাতি উঠল ফুলে'। গরিবের চোখে দেখা দিল হাল আমলের সস্তা আমিরি।

এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গীতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।

দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গ'ড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাচি পান।

বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতি-দাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনো তা ফিরিয়ে নেননি। সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হুহু করে

দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।

ছাদটাকে বৌঠাকরুন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্লের উপরে সারি সারি লম্বা পাম্ গাছ, আশে পাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলন-চাঁপা। ছাদ জখমের কথা মনেই আনেননি, সবাই ছিলেন খেয়ালী।

প্রায় আসতেন অক্ষয় চৌধুরী। তাঁর গলায় সুর ছিল না সে কথা তিনিও জানতেন, অন্যেরা আরো বেশি জানত। কিন্তু তাঁর গাবার জেদ কিছুতে থামত না। বিশেষ করে বেহাগ রাগিণীতে ছিল তাঁর শখ। চোখ বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের মুখের ভাব দেখতে পেতেন না। হাতের কাছে আওয়াজওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে পটাপট শব্দে তাকেই বাঁয়া তবলার বদলি করে নিতেন। মলাট-বাঁধানো বই থাকলে ভালোই চলত। ভাবে ভোর মানুষ, তাঁর ছুটির দিনের সঙ্গে কাজের দিনের তফাৎ বোঝা যেত না।

সন্ধেবেলার সভা যেত ভেঙে, আমি চিরকাল ছিলুম রাত-জাগিয়ে ছেলে। সকলে শুতে যেত আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম ব্রহ্মদত্তির চেলা। সমস্ত পাড়া চুপচাপ। চাঁদনি রাতে ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া

যেন স্বপ্নের আলপনা। ছাদের বাইরে সিসু্ গাছের মাথাটা বাতাসে দুলে উঠছে, ঝিলমিল করছে পাতা-গুলো। জানিনে কেন সবচেয়ে চোখে পড়ত সামনের গলির ঘুমন্ত বাড়ির ছাদে একটা ঢালু পিঠওয়ালা বেঁটে চিলে কোঠা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসের দিকে যেন আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।

রাত একটা হয় দুটো হয়—সামনের বড়ো রাস্তায় রব ওঠে, বলো হরি হরিবোল।

১১

খাঁচায় পাখি পোষার শখ তখন ঘরে ঘরে ছিল। সব চেয়ে খারাপ লাগত পাড়ায় কোনো বাড়ি থেকে পিঁজরেতে বাঁধা কোকিলের ডাক। বৌঠাকরুন জোগাড় করেছিলেন চীন দেশের এক শ্যামা পাখি। কাপড়ের ঢাকার ভিতর থেকে তার শিষ উঠত ফোয়ারার মতো। আরো ছিল নানা জাতের পাখি, তাদের খাঁচাগুলো ঝুলত পশ্চিমের বারান্দায়। রোজ সকালে একজন পোকাওয়ালা পাখিদের খোরাক জোগাত। তার ঝুলি থেকে বেরত ফড়িং, ছাতুখোর পাখিদের জন্যে ছাতু।

জ্যোতিদাদা আমার সকল তর্কের জবাব দিতেন।

কিন্তু মেয়েদের কাছে এতটা আশা করা যায় না। এক-বার বৌঠাকরুনের মর্জি হয়েছিল খাঁচায় কাঠবিড়ালি পোষা। আমি বলেছিলুম কাজটা অন্যায় হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন গুরুমশায়গিরি করতে হবে না। এ'কে ঠিক জবাব বলা চলে না। কাজেই কথা কাটাকাটির বদলে লুকিয়ে ছুটি প্রাণীকে ছেড়ে দিতে হোলো। তার পরেও কিছু কথা শুনেছিলুম, কোনো জবাব করিনি।

আমাদের মধ্যে একটা বাঁধা ঝগড়া ছিল কোনোদিন যার শেষ হোলো না, সে কথা বলছি।

উমেশ ছিল চালাক লোক। বিলিতি দর্জির দোকান থেকে যত সব ছাঁটা-কাটা নানা-রঙের রেশমের ফালি জলের দরে কিনে আনত, তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেস্ মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হোত। কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে মেলে ধরত মেয়েদের চোখে, বলত এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন। ঐ মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না। আমাকে কী ছুঃখ দিত বলতে পারিনে। বারবার অস্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি, জবাবে শুনেছি জ্যাঠামি করতে হবে না। আমি বৌঠাকরুনকে জানিয়েছি এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভদ্র, সেকেলে সাদা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই। আমি ভাবি আজকালকার জর্জেট জড়ানো বৌদিদিদের রংকরা পুতুল-গড়া রূপ দেখে দেওরদের

মুখে কি কোনো কথা সরছে না। উমেশের শেলাই-করা ঢাকনি-পরা বৌঠাকরুন যে ছিলেন ভালো। চেহারার উপর এত বেশি জ্বালিয়াতি তখন ছিল না।

তর্কে বৌঠাকরুনের কাছে বরাবর হেরেছি, কেননা তিনি তর্কের জবাব দিতেন না, আর হেরেছি দাবা খেলায়, সে খেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা।

জ্যোতিদাদার কথা যখন উঠে পড়েছে তখন তাঁকে ভালো করে চিনিয়ে দিতে আরো কিছু বলার দরকার হবে। শুরু করতে হবে আরো একটু আগেকার দিনে।

জমিদারির কাজ দেখতে প্রায় তাঁকে যেতে হোত শিলাইদহে। একবার যখন সেই দরকারে বেরিয়ে ছিলেন আমাকেও নিয়েছিলেন সঙ্গে। তখনকার পক্ষে এটা ছিল বেদস্তুর, অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাসের মতো। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন আমার ছিল আকাশে বাতাসে চ'রে বেড়ানো মন—সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপনা হতেই। তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরো উপরের ক্লাসে উঠেছিল আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে।

পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল

দূরে। নিচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউগাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠিয়াল সাহেবের দাবরাব একেবারে থম্ থম্ করছে। কোথায় নীলকুঠির যমের দূত সেই দেওয়ান, কোথায় লাঠি-কাঁধে কোমরবাঁধা পেয়াদার দল, কোথায় লম্বা টেবিলপাতা খানার ঘর, যেখানে ঘোড়ায় চ'ড়ে সদর থেকে সাহেবরা এসে রাতকে দিন করে দিত, ভোজের সঙ্গে চলত জুড়ি-নৃত্যের ঘূর্ণিপাক, রক্তে ফুটতে থাকত শ্যাম্পেনের নেশা, হতভাগা রায়তদের দোহাইপাড়া কান্না উপরওয়ালাদের কানে পৌঁছত না, সদর জেলখানা পর্যন্ত তাদের শাসনের পথ লম্বা হয়ে চলত। সেদিনকার আর যা কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর। লম্বা লম্বা ঝাউ গাছগুলি দোলাদুলি করে বাতাসে, আর সেদিনকার রায়তদের নাতি-নাৎনিরা কখনো কখনো দুপুর রাত্রে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠিবাড়ির পোড়ো বাগানে।

একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দীঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও

ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পদ্যে। সেগুলো যেন ঝরে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফসলের আমের বোল, ঝরেও গেছে।

তখনকার দিনে অল্পবয়সের ছেলে বিশেষত মেয়ে যদি অক্ষর গুণে দু'ছত্র পদ্য লিখত তাহলে দেশের সমজদাররা ভাবত এমন যেন আর হয় না কখনো হবে না।

সে সব মেয়ে কবিদের নাম দেখেছি কাগজে তাদের লেখাও বেরিয়েছে। তারপরে সেই অতি সাবধানে চোদ্দ অক্ষর বাঁচিয়ে লেখা ভালো ভালো কথা আর কাঁচা কাঁচা মিল যেই গেল মিলিয়ে অমনি তাদের সেই নাম-মোছা পটে আজকালকার মেয়েদের সারি সারি নাম উঠছে ফুটে।

ছেলেদের সাহস মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, লজ্জা অনেক বেশি। সেদিন ছোটো বয়সের ছেলে-কবি কবিতা লিখেছে মনে পড়ে না, এক আমি ছাড়া। আমার চেয়ে বড়ো বয়সের এক ভাগনে একদিন বাৎলিয়ে দিলেন চোদ্দ অক্ষরের ছাঁচে কথা ঢাললে সেটা জমে ওঠে পদ্যে। স্বয়ং দেখলুম এই জাদুবিদ্যের ব্যাপার। আর হাতে হাতে সেই চোদ্দ অক্ষরের ছাঁদে পদ্মও ফুটল, এমন কি তার উপরে ভ্রমরও বসবার জায়গা পেল। কবিদের সঙ্গে

আমার তফাৎ গেল ঘুচে, সেই অবধি এই তফাৎ ঘুচিয়েই চলেছি।

মনে আছে ছাত্রবৃত্তির নিচের ক্লাসে যখন পড়ি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোবিন্দবাবু গুজব শুনলেন যে আমি কবিতা লিখি। আমাকে ফরমাশ করলেন লিখতে, ভাবলেন নর্মালস্কুলের নাম উঠবে জ্বলজ্বলিয়ে। লিখতে হোলো, শোনাতেও হোলো ক্লাসের ছেলেদের, শুনতে হোলো যে এ লেখাটা নিশ্চয় চুরি। নিন্দুকরা জানতে পারেনি তার পরে যখন সেয়ানা হয়েছি তখন ভাব চুরিতে হাত পাকিয়েছি। কিন্তু এ চোরাই মালগুলো দামী জিনিস।

মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন, আত্মীয়রা বললেন ছেলেটির লেখবার হাত আছে।

বৌঠাকরুনের ব্যবহার ছিল উল্টো। কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব এ তিনি কিছুতে মানতেন না। কেবলি খোঁটা দিয়ে বলতেন কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না। আমি মন-মরা হয়ে

ভাবতুম তাঁর চেয়ে অনেক নিচের ধাপের মার্কা যদি মিলত তাহলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর ক্ষুদে দেওর-কবির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত।

জ্যোতিদাদা ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। বৌঠাকরুনকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল। শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্টু ঘোড়া। সে জন্তুটা কম দৌড়বাজ ছিল না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে। সেই এবড়ো খেবড়ো মাঠে পড়ি পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম। আমি পড়ব না তাঁর মনে এই জোর ছিল ব'লেই আমি পড়িনি। কিছুকাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন। সে টাট্টু নয়, বেশ মেজাজি ঘোড়া। একদিন সে আমাকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে যেখানে সে দানা খেত। পরদিন থেকে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

বন্দুক ছোঁড়া জ্যোতিদাদা কস্ত করেছিলেন সে কথা পূর্বেই জানিয়েছি। বাঘ শিকারের ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে। বিশ্বনাথ শিকারী একদিন খবর দিল শিলাই-

দহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে। তখনি বন্দুক বাগিয়ে তিনি তৈরি হলেন। আশ্চর্যের কথা এই, আমাকেও নিলেন সঙ্গে। একটা মুশকিল কিছু ঘটতে পারে এ যেন তাঁর ভাবনার মধ্যেই ছিল না।

ওস্তাদ শিকারী ছিল বটে বিশ্বনাথ। সে জানত মাচানের উপর থেকে শিকার করাটা মরদের কাজ নয়। বাঘকে সামনে ডাক দিয়ে লাগাত গুলি। একবারো ফসকায়নি তার তাক।

ঘন জঙ্গল। সে রকম জঙ্গলের ছায়াতে আলোতে বাঘ চোখেই পড়তে চায় না। একটা মোটা বাঁশগাছের গায়ে কঞ্চি কেটে কেটে মইয়ের মতো বানানো হয়েছে। জ্যোতিদাদা উঠলেন বন্দুক হাতে, আমার পায়ে জুতোও নেই। বাঘটা তাড়া করলে তাকে যে জুতোপেটা করব তারও উপায় ছিল না। বিশ্বনাথ ইশারা করলে। জ্যোতিদাদা অনেকক্ষণ দেখতেই পান না। তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে ঝোপের মধ্যে বাঘের গায়ের একটা দাগ তাঁর চশমাপরা চোখে পড়ল। মারলেন গুলি। দৈবাৎ লাগল সেটা তার শিরদাঁড়ায়। সে আর উঠতে পারল না। কাঠকুটো যা সামনে পায় কামড়ে ধরে ল্যাজ আছড়ে ভীষণ গর্জাতে লাগল। ভেবে দেখলে মনে সন্দেহ লাগে। অতক্ষণ ধরে বাঘটা মরবার জন্যে সবুর করে ছিল সেটা ওদের মেজাজে নেই ব'লেই জানি।

তাকে আগের রাত্রে তার খাবার সঙ্গে ফিকির করে আফিম লাগায় নি তো। এত ঘুম কেন।

আরো একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে। আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার খোঁজে হাতির পিঠে চড়ে। আখের ক্ষেত থেকে পটপট করে আখ উপড়িয়ে চিবতে চিবতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি ভারিক্কি-চালে। সামনে এসে পড়ল বন। হাঁটু দিয়ে চেপে শুঁড় দিয়ে টেনে গাছগুলোকে পেড়ে ফেলতে লাগল মাটিতে! তার আগেই বিশ্বনাথের ভাই চামরুর কাছে গল্প শুনেছিলুম, সর্বনেশে ব্যাপার হয় বাঘ যখন লাফ দিয়ে হাতির পিঠে চ'ড়ে থাবা বসিয়ে ধরে। তখন হাতি গাঁ গাঁ শব্দে ছুটতে থাকে বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পিঠে যারা থাকে গুঁড়ির ধাক্কায় তাদের হাত পা মাথার হিসেব পাওয়া যায় না। সেদিন হাতির উপর চ'ড়ে ব'সে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে ছিল ঐ হাড়-গোড় ভাঙার ছবিটা। ভয় করাটা চেপে রাখলুম লজ্জায়। বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে চাইতে লাগলুম এদিকে ওদিকে। যেন বাঘটাকে একবার দেখতে পেলে হয়। ঢুকে পড়ল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। মাহুত তাকে চেতিয়ে তোলবার চেষ্টাও করল না। দুই শিকারী প্রাণীর মধ্যে বাঘের পরেই তার বিশ্বাস ছিল বেশি। জ্যোতিদাদা বাঘটাকে ঘায়েল

করে মরিয়া করে তুলবেন নিশ্চয় এটাই ছিল তার সব চেয়ে ভাবনার কথা। হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল দেখা নজর, এ যে ঘাড়ে গর্দানে একটা একরাশ মুরদ, অথচ তার ভার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুর বেলার রৌদ্রে চলল সে দৌড়ে। কী সুন্দর সহজ চলনের বেগ। মাঠে ফসল ছিল না। ছুটন্ত বাঘকে ভরপুর করে দেখবার জায়গা এই বটে সেই রৌদ্রঢালা হল্‌দে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।

আর একটা কথা বাকি আছে, শুনতে মজা লাগতে পারে। শিলাইদহে মালী ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় খেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে। টিপে টিপে যে রসটুকু পাওয়া যায় সে কলমের মুখে উঠতে চায় না। ভাবতে লাগলুম একটা কল তৈরি করা চাই। ছেঁদা-ওয়ালা একটা কাঠের বাটি আর তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাবার মতো একটা হামানদিস্তের নোড়া হোলেই চলবে। সেটা ঘোরানো যাবে দড়িতে বাঁধা একটা চাকায়। জ্যোতিদাদাকে দরবার জানালুম। হয়তো মনে মনে তিনি হাসলেন, বাইরে সেটা ধরা পড়ল না। হুকুম করলেন, ছুতোর এল কাঠকোঠ নিয়ে।

কল তৈরি হোলো। ফুলে ভরা কাঠের বাটিতে দড়িতে বাঁধা নোড়া যতই ঘোরাতে থাকি ফুল পিষে কাদা হয়ে যায়, রস বেরয় না। জ্যোতিদাদা দেখলেন ফুলের রস আর কলের চাপে ছন্দ মিলল না। তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন না।

জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম। যে যা নয় নিজেকে তাই যখন কেউ ভাবে, তার মাথা হেঁট করে দেবার এক দেবতা তৈরি থাকেন শাস্ত্রে এমন কথা আছে। সেই দেবতা সেদিন আমার এঞ্জিনিয়ারির দিকে কটাক্ষ করেছিলেন, তার পর থেকে যন্ত্রে হাত লাগানো আমার বন্ধ, এমন কি সেতারে এসরাজেও তার চড়াইনি।

জীবনস্মৃতিতে লিখেছি ফ্লটিলা কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে কী করে জ্যোতিদাদা নিজেকে ফতুর করে দিলেন। বৌঠাকরুনের মৃত্যু হয়েছে তার আগেই। জ্যোতিদাদা তাঁর তেতালার বাসা ভেঙে চলে গেলেন। শেষকালে বাড়ি বানালেন রাঁচির এক পাহাড়ের উপর।

১২

এইবার তেতলা ঘরের আরেক পালা আরম্ভ হোলো আমার সংসার নিয়ে।

একদিন গোলাবাড়ি, পালকি, আর তেতলার ছাদের খালি ঘরে আমার ছিল যেন বেদের বাসা, কখনো এখানে কখনো ওখানে। বৌঠাকরুন এলেন, ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল।

পূর্বদিকের চিলে কোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হোত সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেবার জন্যে আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে। ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত— কাকগুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে রুটির টুকরোর পরে লক্ষ্য করে। দশটা বাজলে ছায়া যেত ক্ষয়ে, ছাতটা উঠত তেতে।

দুপুর বেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নিচের তলায় কাছারিতে। বৌঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হোত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে ঠাণ্ডা করা।

সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল

ঢেকে মোরাদাবাদি খুঞ্চেতে করে জল খাবার বেলা একটা দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।

তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে, সূর্যমুখী আর কুন্দ-নন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হোলো কী হবে দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা।

বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল কাড়াকাড়ি করবার দরকার হোত না, কেননা আমার একটা গুণ ছিল আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুন ভালোবাসতেন। তখন বিজ্‌লি পাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।

১৩

মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারের বাগানে। বিলিতি সওদাগরির ছোঁওয়া লেগে গঙ্গার ধার তখনো জাত খোওয়ায়নি। মুষড়ে যায়নি তার দুইধারে পাখির বাসা, আকাশের আলোয় লোহার কলের শুঁড়গুলো ফুঁসে দেয়নি কালো নিশ্বাস।

গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারে বনের মাথায়। অনেকবার এই রকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি সেদিন তা হোলো না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে—"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।" নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনেকরা এই বাদল দিন আজো রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকটাতে। মনে পড়ে, থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে পালায়, ডিঙি নৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপঝপ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বৌঠাকরুন ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে, ভালো লাগল বলেননি, চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে ষোলো কি সতেরো। যা'তা তর্ক নিয়ে কথা কাটাকাটি তখনো চলে, কিন্তু ঝাঁজ কমে গিয়েছে।

তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হোলো মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই

হয়। রঙিন কাঁচের জানলা দেওয়া উঁচু নিচু ঘর, মার্বল পাথরে বাঁধা মেজে, ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। ঐখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে, সেই সাবরমতী নদীর ধারের পায়চারির সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত। সে বাগান আজ আর নেই, লোহার দাঁত কড়মড়িয়ে তাকে গিলে ফেলেছে ডাণ্ডির কারখানা।

ঐ মোরান বাগানের কথায় মনে পড়ে এক একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছ তলায়। সে রান্নায় মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে পৈতের সময় বৌঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিনদিন তার স্বাদে তার গন্ধে মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।

আমার একটা বড়ো মুশকিল ছিল, শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর আর যে সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।

সেদিনকার সেই তেতালার দিন মিলিয়ে গেল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তারপরে আমার এল তেতালার বসতি, আগেকার সঙ্গে এর ঠিক জোড় লাগানো চলে না।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি যৌবনের সদর দরজায়। আবার ফিরতে হোলো সেই ছেলেবেলার সীমানার দিকে।

এবার ষোলো বছর বয়সের হিসাব দিতে হচ্ছে। তার আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে ভারতী। আজকাল দেশে চারদিকেই ফুটে ফুটে উঠছে কাগজ বের করবার টগবগানি। বুঝতে পারি সে নেশার জোর, যখন ফিরে তাকাই সেদিনকার খ্যাপামির দিকে। আমার মতো ছেলে, যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল অথচ সেটা কারো নজরে পড়ল না, এর থেকে জানা যায় চারদিকে ছেলে-মানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল। দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তখন দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শন। আমাদের এ ছিল কাঁচাপাকা, বড়দাদা যা লিখছেন তা লেখাও যেমন শক্ত, বোঝাও তেমনি, আর তারি মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প, সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।

এইখানে বড়দাদার কথাটা ব'লে নেবার সময় এল। জ্যোতিদাদার আসর ছিল তেতালার ঘরে, আর বড়দাদার ছিল আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়। এক সময়ে তিনি ডুবেছিলেন আপন মনে ভারি ভারি তত্ত্ব কথা নিয়ে, সে

ছিল আমাদের নাগালের বাইরে। যা লিখতেন যা ভাবতেন তা শোনাবার লোক ছিল কম। যদি কেউ রাজি হয়ে ধরা দিত তাকে উনি ছাড়তে চাইতেন না, কিংবা সে ওঁকে ছাড়ত না, ওঁর উপর যা দাবি করত সে কেবল তত্ত্বকথা শোনা নিয়ে নয়। একটি সঙ্গী বড়দাদার জুটেছিলেন, তাঁর নাম জানিনে, তাঁকে সবাই ডাকত ফিলজফার ব'লে। অন্য দাদারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন, কেবল তাঁর মটন চপের পরে লোভ নিয়ে নয় দিনের পর দিন তাঁর নানা রকমের জরুরি দরকার নিয়ে। দর্শনশাস্ত্র ছাড়া বড়দাদার শখ ছিল গণিতের সমস্যা বানানো। অঙ্কচিহ্নওয়ালা পাতাগুলো দক্ষিণে হাওয়ায় উড়ে বেড়াত বারান্দাময়। বড়দাদা গান গাইতে পারতেন না, বিলিতি বাঁশি বাজাতেন, কিন্তু সে গানের জন্য নয়, অঙ্ক দিয়ে এক এক রাগিণীতে গানের সুর মেপে নেবার জন্যে। তার পরে এক সময়ে ধরলেন স্বপ্নপ্রয়াণ লিখতে। তার গোড়ায় শুরু হোলো ছন্দবানানো, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাংলা ভাষার ধ্বনির বাটখারায় ওজন করে করে সাজিয়ে তুলতেন, তার অনেকগুলো রেখেছেন অনেকগুলি রাখেননি, ছেঁড়া পাতায় ছড়াছড়ি গেছে। তার পরে কাব্য লিখতে লাগলেন, যত লিখে রাখতেন তার চেয়ে ফেলে দিতেন অনেক বেশি। যা লিখতেন তা সহজে পছন্দ হোত না। তাঁর সেই সব

ফেলাছড়া লাইনগুলো কুড়িয়ে রাখবার মতো বুদ্ধি আমাদের ছিল না। যেমন যেমন লিখতেন শুনিয়ে যেতেন, শোনবার লোক জমত তাঁর চারদিকে। আমরা বাড়ি সুদ্ধ সবাই মেতে গিয়েছিলুম এই কাব্যের রসে। পড়ার মাঝে মাঝে উচ্চহাসি উঠত উথলিয়ে। তাঁর হাসি ছিল আকাশভরা, সেই হাসির ঝোঁকের মাথায় কেউ যদি হাতের কাছে থাকত তাকে চাপড়িয়ে অস্থির করে তুলতেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাণের একটি ঝরনা-তলা ছিল এই দক্ষিণের বারান্দা, শুকিয়ে গেল এর স্রোত, বড়দাদা চলে গেলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমে। আমার কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ে ঐ বারান্দার সামনেকার বাগানে মন-কেমন-করা শরতের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে, আমি নতুন গান তৈরি করে গাচ্ছি "আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।" আর মনে আসে একটি তপ্ত দিনের ঝাঁ ঝাঁ দুই প্রহরের গান, "হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন সনে।"

বড়দাদার আর একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো, সে তাঁর সাঁতার কাটা। পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশ বার এপার ওপার করতেন। পেনেটির বাগানে যখন ছিলেন তখন গঙ্গা পেরিয়ে চলে যেতেন অনেকদূর পর্যন্ত। তাঁর দেখাদেখি সাঁতার আমরাও

শিখেছি ছেলেবেলা থেকে। শেখা শুরু করেছিলুম নিজে নিজেই। পায়জামা ভিজিয়ে নিয়ে টেনে টেনে ভরে তুলতুম বাতাসে। জলে নামলেই সেটা কোমরের চারদিকে হাওয়ার কোমরবন্দর মতো ফুলে উঠত। তার পরে আর ডোববার জো থাকত না। বড়োবয়সে যখন শিলাইদহের চরে থাকতুম তখন একবার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলুম। কথাটা শুনতে যতটা তাক লাগানো আসলে ততটা নয়। মাঝে মাঝে চরা-পড়া সেই পদ্মার টান ছিল না তাকে সমীহ করবার মতো, তবু ডাঙার লোকের কাছে ভয়-লাগানো গল্পটা শোনাবার মতো বটে, শুনিয়েওছি অনেকবার। ছেলে-বেলায় যখন গিয়েছি ড্যালহৌসী পাহাড়ে, পিতৃদেব আমাকে একা একা ঘুরে বেড়াতে কখনো মানা করেননি। পায়ে-চলা রাস্তায় আমি ফলাওয়ালা লাঠি হাতে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে উঠে যেতুম। তার সকলের চেয়ে মজা ছিল মনে মনে ভয় বানিয়ে তোলা। একদিন ওৎরাই পথে যেতে যেতে পা পড়েছিল গাছের তলায় রাশ-করা শুকনো পাতার উপর। পা একটু হড়কে যেতেই লাঠি দিয়ে ঠেকিয়ে দিলুম। কিন্তু না ঠেকাতেও তো পারতুম। ঢালু পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে অনেকদূর নিচে ঝরনার মধ্যে পড়তে কতক্ষণ লাগত। কী যে হোতে পারত সেটা

এতখানি করে মার কাছে বলেছি। তা ছাড়া ঘন পাইনের বনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ভালুকের সঙ্গে দেখা হোলেও হোতে পারত এও একটা শোনাবার মতো জিনিস ছিল বটে। ঘটবার মতো কিছুই ঘটেনি কাজেই অঘটন সব জমিয়ে ছিলুম মনে। আমার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার গল্পও এ সব গল্পের থেকে খুব বেশি তফাৎ নয়।

সতেরো বছরে পড়লুম যখন, ভারতীর সম্পাদকি বৈঠক থেকে আমাকে সরে যেতে হোলো।

এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পরামর্শ হোলো জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে। তিনি তখন জজিয়তি করছেন আমেদাবাদে, মেজ বৌঠাকরুন আর তাঁর ছেলে-মেয়ে আছেন ইংলণ্ডে, ফর্লো নিয়ে মেজদাদা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন এই অপেক্ষায়।

শিকড় সুদ্ধ আমাকে উপড়ে নিয়ে আসা হোলো এক ক্ষেত থেকে আর এক ক্ষেতে। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু হোলো। গোড়াতে সব তাতেই খটকা দিতে লাগল লজ্জা। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপে নিজের মানরক্ষা করব কী করে এই ছিল ভাবনা। যে অচেনা সংসারের সঙ্গে মাখামাখিও সহজ ছিল না, আর

পথ ছিল না যাকে এড়িয়ে যাওয়ার, আমার মতো ছেলের মন সেখানে কেবলি হুঁচট খেয়ে মরত।

আমেদাবাদে একটা পুরোনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে, বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্ছার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার।

কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথা-তোলা চেহারা কোথাও দেখিনি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে তার পিছনফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নিচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের।

সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবৎখানায় বাজছে রসনচৌকি দিন রাত্রে অষ্ট প্রহরের রাগিণীতে,

রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়-সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝকঝকিয়ে। বাদশাহী দরবারের চারদিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুসফাস্। অন্দর মহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাব-জলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ কাঁকনের ঝনঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো, তার চারদিকে কোথাও নেই সেই রং, নেই সেই সব ধ্বনি, শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।

পুরোনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে, তার মাথার খুলিটা আছে মুকুট নেই। তার উপরে খোলষ মুখোষ পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের জাদুঘরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি তা বললে বেশি বলা হবে। চালচিত্তির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা। কিছু মনে থাকে অনেকখানি ভুলে যাই ব'লে এই রকম জোড়াতাড়া দেওয়া সহজ হয়। আশি বছর পরে এসে নিজেরই যে একখানা রূপ সামনে আজ দেখা দিয়েছে আসলের সঙ্গে তার সবটা লাইনে লাইনে মেলে না, অনেকখানি সে মনগড়া।

এখানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন,

বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেই রকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোনো একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে ঝকঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেননি। পুঁথি-গত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সব চেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান্ দিয়েছিলেম, তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেননি, মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে, শুনলেন সেটা ভোর বেলাকার ভৈরবী সুরে, বললেন কবি তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণ দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি। এর থেকে বোঝা যাবে, মেয়েরা যাকে আদর

জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে, সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্যেই। মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত।

যেমন একবার আমাকে বিশেষ ক'রে বলেছিলেন একটা কথা আমার রাখতেই হবে তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না—তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে। তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয়নি সেকথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।

১৪

যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলা দেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল। সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই। তার মাল-মসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল আর কিছু কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে। অনেক সময়ে এইখানেই গড়নের কাজ থেমে যায়। এর উপরে লেখাপড়া শিক্ষার কারখানাঘরে যাদের বিশেষ রকম গড়ন পিটন ঘটে তারা বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায়।

আমি দৈবক্রমে ঐ কারখানাঘরের প্রায় সমস্তটাই এড়িয়ে গিয়েছিলুম। মাস্টার পণ্ডিত যাঁদের বিশেষ করে রাখা হয়েছিল তাঁরা আমাকে তরিয়ে দেবার কাজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় ছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মশায়ের পুত্র, বি এ পাশ-করা। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন লেখাপড়া শেখার বাঁধা রাস্তায় এ ছেলেকে চালানো যাবে না। মুশকিল এই যে, পাশ-করা ভদ্রলোকের ছাঁচে ছেলেদের ঢালাই করতেই হবে একথাটা তখনকার দিনের মুরুব্বিরা

তেমন জোরের সঙ্গে ভাবেননি। সেকালে কলেজি বিদ্যার একই বেড়াজালে ধনী অধনী সকলকেই টেনে আনবার তাগিদ ছিল না। আমাদের বংশে তখন ধন ছিল না কিন্তু নাম ছিল তাই রীতিটা টিঁকে গিয়েছিল। লেখাপড়ার গরজটা ছিল ঢিলে। ছাত্রবৃত্তির নিচের ক্লাস থেকে এক সময়ে আমাদের চালান করা হয়েছিল ডিক্রুজ সাহেবের বেঙ্গল একাডেমিতে। আর কিছু না হোক ভদ্রতা রক্ষার মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে অভিভাবকদের এই ছিল আশা। ল্যাটিন শেখার ক্লাসে আমি ছিলুম বোবা আর কালা, সকল রকম একসেসাইজের খাতাই থাকত বিধবার থান কাপড়ের মতো আগাগোড়াই সাদা। আমার পড়া না করবার অদ্ভুত জেদ দেখে ক্লাসের মাস্টার ডিক্রুজ সাহেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। ডিক্রুজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পড়াশোনা করবার জন্যে আমরা জন্মাইনি। মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে দেবার জন্যেই পৃথিবীতে আমাদের আসা। জ্ঞানবাবু কতকটা সেই রকমই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এরি মধ্যে তিনি একটা পথ কেটেছিলেন। আমাকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দিলেন কুমারসম্ভব। ঘরে বন্ধ রেখে আমাকে দিয়ে ম্যাকবেথ তর্জমা করিয়ে নিলেন। এদিকে রামসর্বস্বপণ্ডিত মশায় পড়িয়ে দিলেন শকুন্তলা। ক্লাসের পড়ার বাইরে আমাকে

দিয়েছিলেন ছেড়ে, কিছু ফল পেয়েছিলেন। আমার ছেলেবয়সের মন গড়বার এই ছিল মালমসলা, আর ছিল বাংলা বই যা'তা, তার বাছবিচার ছিল না।

উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবন গঠনে আরম্ভ হোলো বিদিশি কারিগরি। কেমিস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি। এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমতো নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে ; কিছু কিছু চেষ্টা হোতে লাগল কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজ-বোঠান ছিলেন, ছিল তাঁর ছেলে মেয়ে, জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে। ইস্কুল মহলের আশে পাশে ঘুরেছি, বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা। নানা দিক থেকে বিলেতের আবহাওয়ার কাজ চলতে লাগল মনের উপর।

পালিত সাহেব আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন ঘরের বাঁধন থেকে। একটি ডাক্তারের বাড়িতে বাসা নিলুম। তাঁরা আমাকে ভুলিয়ে দিলেন যে বিদেশে এসেছি। মিসেস স্কট আমাকে যে স্নেহ করতেন সে একেবারে খাঁটি। আমার জন্যে সকল সময়েই মায়ের মতো ভাবনা ছিল তাঁব মনে। আমি তখন লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে ভরতি হয়েছি, ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মরলি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান দেওয়া শুকনো মাল

নয়। সাহিত্য তাঁর মনে তাঁর গলার সুরে প্রাণ পেয়ে উঠত, আমাদের সেই মরমে পৌঁছত যেখানে প্রাণ চায় আপন খোরাক, মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হোত না। বাড়িতে এসে ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসের বইগুলি থেকে পড়বার বিষয় উলটেপালটে বুঝে নিতুম। অর্থাৎ নিজের মাস্টারি করার কাজটা নিজেই নিয়েছিলুম। না-হক্ থেকে থেকে মিসেস স্কট মনে করতেন আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তিনি জানতেন না ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বন্ধ। প্রতিদিন ভোরবেলায় বরফগলা জলে স্নান করেছি। তখনকার ডাক্তারি মতে এ রকম অনিয়মে বেঁচে থাকাটা যেন শাস্ত্র ডিঙিয়ে চলা।

আমি য়ুনিভর্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিনমাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমসলা। তিনমাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা করে কাব্যনাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের

মিলন। বিলেতে গেলেম, বারিস্টর হইনি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাইনি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব পশ্চিমের হাত মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।

বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা, হাল্‌কা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিংপরে ডাকত এসে কাক।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে
তপ্‌সিমাছের ঝুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে।
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের পরে দাদা,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হোত তাঁর সাধা।

ছেলেবেলা

জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে ঘের দেওয়া তাঁর শাড়িটি লাল পেড়ে।
চুরি করে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান্ উপদ্রবে।
কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হোলে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুতলয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া ;
মনে মনে ইচ্ছে হোত যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হোত এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।
স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।
অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।
ম্যাপে যে সব পাহাড় জানি, জানি যে সব গাং,
কুয়েনলুন্ আর মিসিসিপি ইয়াংসিকিয়াং,
জানার সঙ্গে আধেক জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,

ছেলেবেলা

নানা রকম ধ্বনির সঙ্গে নানান্ চলাফেরা
সব দিয়ে এক হাল্‌কা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাবনাগুলো তারি মধ্যে ফিরত থাকি থাকি,
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

—ছড়ার ছবি

শান্তিনিকেতন
আষাঢ়, ১৩৪৪